দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র জীবনে সঙ্গীত সৃষ্টির সূচনাপর্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র জীবনে সঙ্গীত সৃষ্টির সূচনাপর্ব

।। এক।।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের অনন্য সাধারণ সাংগীতিক শৈক্ষিক ও সার্বিক চেতনা উন্মেষের পরিবেশই রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভাকে পরিপূর্ণ বিকাশে সব থেকে বেশী সহায়তা করেছিল। এই পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই একেকজন অসামান্য ব্যক্তিত্ব। তাঁরা সকলেই উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁদের বিচিত্র কর্মের মধ্য দিয়ে যে মনোরম পরিবেশ বাড়িতে সৃষ্টি করেছিলেন তা নিশ্চিত ভাবে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশকে সহজ করেছিল। সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা, স্বদেশীয়ানা, অভিনয়– সকল ক্ষেত্রেই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি নানাভাবে উৎসাহী ছিলেন। আর এই সবগুলি বিষয়েরই তখন প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠাকুরবাড়ি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে এক রৈখিক, সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার কোনই সার্থকতা নেই, কেননা তার পরিধি বিরাট ও বিস্তৃত, এতই তার ভাব ও মাধুর্যের গভীরতা যে, সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিচিত্র সঙ্গীতধারার মিলন হয়েছে তাঁর গানে, অথচ সকল প্রভাবকে অতিক্রম করে তাঁর গান আপন বৈশিষ্ট্যের স্বর্ণসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি, কবির দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিশ্ব প্রকৃতির মর্মস্থলে তাই পেয়েছিলেন অনির্বচনীয় এক সত্য বা সত্তার অনুভূতি এবং সেই সত্তানুভূতির দীপ্তি ও দৃষ্টি নিয়েই রচনা করেছিলেন তাঁর সঙ্গীত। তিনি বলেছেন, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে অহরহঃ যে অনির্বচনীয় অনাহত ধ্বনি ও অপার্থিব সুর, তারই সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি তাঁর জীবনে এবং তারই অবগুণ্ঠন মোচন করে লক্ষ্য করেছিলেন তিনি বিশ্বসঙ্গীতের অনন্ত ধারা ও মহিমা। তাই নিজের অন্তরেও উৎসারিত হয়েছিল তার উচ্ছ্বল প্রবাহ। তিনি বলেছেন–

''সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলেছে, গান শুনে সেটারই বেদনাবেগ যেন আমরা অনুভব করি।''[১]

গান রচনাকালে এই অনুভূতিই তাঁর অনন্য প্রতিভায় আনতো সচঞ্চল প্রেরণা এবং সেই প্রেরণার অভিঘাতে কী কাব্যে, কী সুরে, কী সংগীতে তিনি প্রদীপ্ত করেছেন এক হৃদয়স্পর্শী আবেদন।

প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নূতন সৃষ্টিপথের পথিক, আবার পুরাতনকেও তিনি সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু অন্ধ-অনুসরণ করেননি, বরং পুরাতনের সঙ্গে নূতনের বন্ধন ঘটিয়েছেন এবং তাতে নূতন সৃষ্টির পথ উৎসারিত হয়েছে। তিনি তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টির মাধ্যমে এই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনির্বচনীয় সুরের খেলাই একমাত্র প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না, তাকে ব্যক্ত বা প্রকাশ করায়, কথার বা বাণীর সহযোগিতা অবশ্যই থাকা উচিত। কথা ও সুরের বেণীবন্ধনে সঙ্গীতের মূর্তি হয় লীলায়িত, কথা ও সুরের অর্ধনারীশ্বরমূর্তিই সঙ্গীতের সামগ্রীক রূপ ও মাধুর্যকে গড়ে তোলে। সঙ্গীতের নৈবদ্যে সুরের চাহিদা বেশী হলেও কথার মূল্যকে গুরুত্বহীন করলে চলবে না। তাই তাঁর গান বা সঙ্গীতের মূল কথা হল কথা ও সুরের মধ্যে থাকবে ভারসাম্য, মৈত্রী ও মিলনের দৃষ্টিভঙ্গি। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীত হল কাব্য প্রধান গান। কাব্যরক্ষার্থেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবর্তন করেছিলেন গানের সুর, ছন্দ ও লয়কে। এবং এই বৈশিষ্ট্য নিয়েই রবীন্দ্রনাথের গান বা রবীন্দ্রসঙ্গীত অনন্য সাধারণ।

।। দুই।।

এই সূত্র ধরেই কবির জীবনে সৃষ্টির সূচনাপর্ব সূচিত হয়েছে, কাব্যচর্চার হাত ধরে। তাঁর কবিতা রচনার অনুরাগ বাল্যকাল থেকেই প্রকট হয়েছিল। 'বর্ণ-পরিচয়ের' মধ্যে ছন্দে-বাঁধা কথা পড়ে তিনি শৈশবেই ভীষণ পুলকিত হয়েছিলেন। শিশু বয়স থেকেই তিনি ছিলেন কল্পনা প্রবণ। তাই তো 'ছেলেবেলা'তে তিনি কী অনায়াসে তাঁর ঠাকুরমাদের আমলের এক পাল্কি, যেটা কি না তাঁর ভাষায় ''নাম কাটা আসবাব, সকল দরকারের কাজ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে''। সেই পাল্কি যেন সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপ, কখনো বা হাওয়ায় তৈরী বেহারাগুলো নিয়ে চলেছে তাঁর সেই অচল পাল্কি আবার কোনো এক সময় সেই পাল্কি চেহারা বদলে হয়ে উঠতো ময়ূরপাখি, কিংবা কখনো তিনি নিজে ছুটির দিনের রবিনসন ক্রুশো। এইরকম রূপকথার অপূর্ব সুন্দর কল্পনায় হারিয়ে

যেতেন।

বাল্যকালেই এ বিষয়ে তাঁর হাতে খড়ি হয়েছিল ভাগ্নে জ্যোতিপ্রকাশের কাছে। তাঁর রচনার খ্যাতি বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়ের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল। আর তাই শিশুরবিকে উৎসাহ দেবার জন্য মাঝে মধ্যে দু'-একটি পদ কবিতা দিয়ে, তাকে পূরণ করে আনতে বলতেন। কবি 'জীবনস্মৃতি'তে শৈশবের স্মৃতি মুগ্ধ চিত্তে উল্লেখ করেছেন এভাবে–

''সাতকড়ি দত্ত মহাশয় যদিচ আমাদের ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন না তবু আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ ছিল।... তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি নাকি কবিতা লিখিয়া থাক।'

লিখিয়া যে থাকি সে-কথা গোপন করি নাই। ইহার পর হইতে তিনি আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই এক পদ কবিতা দিয়া তাহা পূরণ করিয়া আনিতে বলিতেন। তাহার মধ্যে একটি আমার মনে আছে–

রবি করে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

আমি ইহার সঙ্গে যে পদৎ জুড়িয়াছিলাম তাহার কেবল দুটো লাইন মনে আছে। আমার সেকালের কবিতাকে কোনোমতেই যে দুর্বোধ বলা চলে না, তাহারই প্রমাণ স্বরূপে লাইন দুটোকে এই সুযোগে এখানেই দলিলভুক্ত রাখিলাম–

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

ইহার মধ্যে যেটুকু গভীরতা আছে তাহা সরোবর সংক্রান্ত অত্যন্তই স্বচ্ছ।''[২]

এভাবেই তাঁর ছোট বেলার ফুল্‌স্‌ক্যাপের নীল খাতা ক্রমেই কাব্য ছন্দে ভরে উঠেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন–

''সেই নীল খাতাটি ক্রমেই বাঁকা-বাঁকা লাইনে ও সরু-মোটা অক্ষরে
কীটের বাসার মতো ভরিয়া উঠিতে চলিল।''[৩]

শুধু কবিতা লিখে ক্ষান্ত হননি, নিজের কল্পনায় নিজেকে কবি বলে পরিচিত হওয়ার একটা চেষ্টাও জন্মিয়েছিল আর তাই হয়তো বোলপুরে বাগানের প্রান্তে, নারকেল গাছের তলায় বসে পা ছড়িয়ে, বীররসাত্মক কাব্য 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' লিখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কবি 'জীবনস্মৃতি'তে

লিখেছেন–

> ‘‘ইতিমধ্যে সেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন নীল খাতাটি বিদায় করিয়া একখানা বাঁধানো লেট্‌স্‌ ডায়রি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।... শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে। এইজন্য বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেলগাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালো বাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে ‘পৃথ্বীরাজের পরাজয়’ বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম।’’[৪]

যদিও পরবর্তীকালে সেই নীল খাতা ও সেই বাঁধানো লেট্‌স্‌ ডায়রি, দুটোই কোথায় যে বিলুপ্ত হয়েছে তার ঠিকানা কারও কাছে রেখে যায়নি। ওদিকে বাড়ির পরিবেশও তাঁকে শুধু কাব্য-রচনায় উৎসাহিত করেনি, উচ্চশ্রেণির কবিতা ও খ্যাতিমান কবির সঙ্গে পরিচয়ও ঘটিয়ে দিয়েছিল।

।। তিন।।

রবীন্দ্রনাথের প্রদীপ্ত ভাস্বর কর্মবহুল জীবনের যে কোনো প্রসঙ্গ স্পর্শ করতে গেলেই তাঁর মনোগঠনে যাঁদের দান সর্বাধিক সেই পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করতেই হয়। কৈশোরে ও যৌবনের প্রথমার্ধে এই জ্যোতিদাদাই তো ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ। তাঁর সব থেকে বড় কীর্তি বোধ হয় এই অনুজটির প্রতিভার বিকাশের সাহায্য করা। তা তিনি করেছিলেন জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে, নানাভাবে। উভয়ের বয়সের ব্যবধান ছিল বারো বৎসরের। এই অবস্থায় সাধারণত দুই ভ্রাতার মধ্যে সাহচর্য বড় একটা ঘটে না। কিন্তু এই অসাধারণ ঘটনা এই পরিবারে ঘটেছিল দুটি কারণে। প্রথম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শুধু শিল্পী ছিলেন না, তিনি ছিলেন গুণগ্রাহী। কাজেই শিল্পচর্চার উপযুক্ত গুণী সহযোগী খুঁজে পেলে, তিনি তাকে সাদরে গ্রহণ করতেন, অপরপক্ষে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ, বাল্যাবস্থাতেও নিজ গুণ অগ্রজের কাছে গোপন রাখতে পারেন নি। তাঁর আচরণে তো আপনি ধরা পড়ে গিয়েছিল একটি নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে। ফলে শিল্প ও সাহিত্য সাধনায় এই বালক বয়সী

অনুজটিকে পূর্ণ সম্মান সহকারে গ্রহণ করে, সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। এই অসাধারণ ঘটনা ঘটার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তা না হলে রবীন্দ্রপ্রতিভা হয়ত পরিপূর্ণ বিকাশ করার সুযোগ পেত না। এ বিষয়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ নিজেও অবহিত ছিলেন। তাই তিনি তাঁর ছোটবেলায় রচিত 'রূদ্র চণ্ড' নামক নাটিকাটিকে তাঁর কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিরূপে, নতুনদাদার নামে উৎসর্গ করেন।

তাছাড়া রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশে, এই পরিবারে আরও একজনের দান রয়েছে যা সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি হলেন স্বয়ং জ্যোতিদাদার সহধর্মিনী কাদম্বরী দেবী। মাত্র ৯ বছর বয়সে ঠাকুরবাড়িতে জ্যোতিদাদার স্ত্রী হয়ে আসেন। তাঁর এমন কতকগুলি গুণ ছিল যা স্বভাবতই বালক রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। এই নতুন বৌঠানই তাঁকে স্নেহ দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে, শুধু তাঁর একাকীত্ব ঘুচিয়ে দেন নি, শিল্প সৃষ্টির অর্গলমুক্ত করে পূর্ণ প্রকাশে অসীম সহায়তা করেছেন। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের যখন মাতৃবিয়োগ হয়, তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ বছরও পূর্ণ হয়নি। মাতৃবিয়োগের পর, বাড়ির অনেক বধূর মধ্যে, বৌঠানই এই দারুণ দুর্দিনে, তাঁকে শোকের আঘাত হতে রক্ষা করতে এবং সেবা ও যত্ন দিয়ে মাতৃবিয়োগের দুঃখকে লঘু করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে বৌঠান এই দেবরটির বাল্য জীবনে সত্যই আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। প্রতিদিনের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে প্রাণের স্পর্শ দিয়েছিলেন। এহেন ভাবনার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণা থেকে–

> ''বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইযা সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন।''[৫]

বালক রবির কাব্যশক্তির লক্ষণ যখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পেল, তখন এই বৌঠানেরই স্নেহাশ্রয়ে তা ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করতে লাগল। বালক কবিকে উৎসাহ দিতে যেমন ছিলেন অগ্রগণ্যা তেমনি কোন কবিতা রচিত হলেও তা শুনতে হত প্রথম নতুন বৌঠানকেই। এইভাবে তাঁর কাছে উৎসাহে পেয়ে পেয়ে এই নবীন কবির কাব্য সৃষ্টির ফধধারা ক্রমশ উন্মুখ হতে লাগল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নিজেকে অনন্য সাধারণ কবি হিসাবে গড়ে তোলবার সাধনা তাঁর বাল্যকাল থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। বাড়ির পরিবেশের সাথে সাথে এমন একজন স্নেহশীলা সহানুভূতি

সম্পন্না হিতৈষিণী আত্মীয়া পেয়েছিলেন, যিনি তাঁকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে ঠিক পথে পরিচালিত করতেন, তিনি বৌঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবী।

সেকালের রীতি অনুসারে বাল্যকালেই বিয়ে হয়ে শ্বশুর ঘর করতে এসেও, তাঁর স্বকীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ অক্ষুন্ন ছিল। নিজের আগ্রহের প্রেরণায়, তিনি এই শ্বশুর বাড়িতেই সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। বই পড়া তাঁর অবসর সময় যাপনের উপায়মাত্র ছিল না, সাহিত্যচর্চার অঙ্গ ছিল। জ্যোতিদাদা যেমন সঙ্গীতচর্চায় রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গী করে নিয়েছিলেন, তেমনি বৌঠানও পেয়েছিলেন সাহিত্যচর্চার সঙ্গী হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–

> ''সাহিত্যে বউ ঠাকুরানীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে – তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় আমি অংশী ছিলাম।''[৬]

এই উদীয়মান কবি কৈশোরের পর যখন তরুণ কবি হয়ে বিকাশলাভ করতে লাগলেন, তাঁর কাব্যজীবনের সেই সন্ধিক্ষণে এমন একটি স্নেহশীলা সাহিত্যরসিক বৌঠানের তাঁকে ঠিকপথে পরিচালিত করবার জন্য প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজের সাহিত্য জীবনের এই অধ্যায়টিকে 'কপিবুকের যুগ' নাম দিয়েছিলেন। এই সময় যেমন একদিকে উৎসাহ দিয়ে কবিতা লেখায় নিযউক্ত করা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মানুষটিকে আত্মগৌরব বোধ হতে মুক্ত রাখা। মনের এই অপরিণত অবস্থায় আত্মক্ষমতার উপর যত বেশী আস্থা আসবে, ততই কাব্যশক্তির উৎকর্ষসাধনে শিথিলতা আসবে।

কবির নতুন বৌঠান এই কঠিন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই একদিকে তিনি কবির রচনা শুনেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন এবং প্রকাশ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। অন্যদিকে কবির বিভিন্ন রচনার প্রথম পাঠক হিসাবে কঠোর সমালোচকের ভূমিকা পালন করে কবিকে সামনে এগিয়ে যেতে যাহায্য করেছেন।

কবির শৈশবের রচনাতে বৌঠান যে তাঁর মুখ্য শ্রোতা, সমালোচক এবং উৎসাহদাতা ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর বৎসরই তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে বাল্যকালে রচিত দু'খানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রথমটি হল 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' ও দ্বিতীয়টি হল 'শৈশব সঙ্গীত'। এই

কবিতাগুলি রচনায় যে বৌঠানই প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তিনিই গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্যে বার বার অনুরোধ করেছিলেন এ কথা কবি কৃতজ্ঞচিত্তে উৎসর্গপত্রেই স্বীকার করেছেন।

কবির কাব্যরস সৃষ্টির সূচনা পর্বের 'শৈশব সঙ্গীত' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল তাঁর ১৩ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে। পরবর্তীকালে কিছু কিছু কবিতায় সুর দিয়ে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন। কিংবা কখনো সঙ্গীতের প্রয়োজনে কবিতার কথাকে অদল বদল করেছিলেন।

বলাবাহুল্য, তিনি মোট দু'হাজারের ওপর গান রচনা করেছিলেন। প্রত্যেকটি সঙ্গীতের স্বরলিপি তিনি নিজে তৈরি করে দিয়ে গেছেন। এটি সম্ভব হয়েছিল সঙ্গীতে তাঁর অসামান্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই। স্বভাবতই তাঁর যেমন কবিতায় ব্যুৎপত্তি ছিল, তেমন গানেও ছিল। অর্থাৎ শৈশব থেকেই তিনি সঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন।

চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ নতুনদাদার ছায়াসঙ্গী ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন 'সরোজিনী' নাটক রচনা করেছিলেন। তখন সেই নাটক রচনার সূত্রেই তাঁর অনুজ রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে তিনি এত খুশি হয়েছিলেন, যে তাঁকে পরবর্তীকালে কাব্যচর্চার সঙ্গী করে নিয়েছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গীতচর্চার রূপ ছিল ভিন্ন ধরনের। তিনি শুধু সঙ্গীত অভ্যাস করেই ক্ষান্ত হতেন না, তিনি সুরকার হবার জন্য সাধনা করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি পিয়ানো যোগে নূতন সুর-সৃষ্টির সাধনা করতেন। এ বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ছিলেন অন্যতম সহায়ক। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই ত্রয়ীর কথা উল্লেখ করেছেন–

> ''সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণিতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চাতে আমরা হইলাম তিন– অক্ষয়, রবি ও আমি।''[৭]

নূতন সুর রচনাকালে এই তিন জনের কাজ ছিল এই রকম, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজিয়ে নূতন সুর তুলতেন, ওদিকে অক্ষয় চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ সেই সুরগুলিকে কথার সাথে সংযুক্ত করে গানের আকারে ধরে রাখতে চেষ্টা করতেন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন–

> ''এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরী করায়

মাতিয়া ছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলি নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুর বর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম।"[৮]

এই ভাবেই তৈরী হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের শেষ গান 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ', 'আয় তবে সহচরী', তৈরি হয়েছে 'বাল্মিকী প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'র গান এবং এইভাবেই আরো অন্তত কুড়ি পঁচিশটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের জ্যোতিরিন্দ্র সুর চাপা পড়ে আছে 'স্বরবিতানে'র পাতায়। দুই ভাই মিলে শুরু করেছিলেন সঙ্গীত দ্রোহিতা। হিন্দুস্থানী বৈঠকী গানের গৎ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে বিলিতি সুরে তৈরি হয়েছে স্কচ-ভূপালী কিংবা ইতালিয়ান ঝিঁঝিট। গানের পর গান, নাটকের পর নাটক। এই গানের ঝরণাতলাতেই জন্ম নিয়েছে পরবর্তীকালের রবীন্দ্রসঙ্গীত, জন্ম নিয়েছে রবীন্দ্র সাহিত্য। ইংরেজি, ফরাসি, সংস্কৃত এবং মারাঠি সাহিত্যে সুপণ্ডিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক প্রবন্ধ গল্প কবিতা অনুবাদ অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছে প্রতিদিন প্রতিরাত্রি, আর সেই ধারায় নিত্য অবগাহন করে নতুন রসের সন্ধান পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতিদাদার পিয়ানোর সুরের সাথে সাথে এইভাবেই চললো গানের মহড়া ও গানের রচনা। রচনা করলেন তিনি কাব্যসৌন্দর্য দিয়ে কত শত হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ, ধামার প্রভৃতি শৈলীর গান। রচিত হল ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা উপলক্ষে ব্রহ্মসঙ্গীত ও মাঘোৎসব-এর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আরও কিছু সঙ্গীত।

।। চার।।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীত রচনার আদিপর্বে যে সকল গান রচনা করে গিয়েছেন, সেগুলির অধিকাংশের মধ্যেই হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পদ্ধতির (বিশেষ করে রাগ-রাগিনী তাল-লয়ের) পূর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়কদের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁদের প্রভাব ইত্যাদি, ঐতিহাসিক তথ্য ও তার আলোচনা আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের তত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা ও গবেষণাধর্মী বিভিন্ন গ্রন্থে।

প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল কীর্তি 'ভানুসিংহের পদাবলী'। মাত্র ষোলো থেকে পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে ব্রজবুলী ভাষায় তা রচনা করেছিলেন। 'কবি ভানুসিংহ' এই ছদ্মনামে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণ গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের সময়কালেই বৈষ্ণব পদাবলীর সুবর্ণ যুগ বলা যেতে পারে। মূলতঃ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবিদের প্রেরণার উৎস বললে অত্যুক্তি হয় না। জয়দেবের পরে বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও বিদ্যাপতির পদগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য রত্নরাজি বলে পরিগণিত হয়। এর পর একে একে জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস (দীন), গোবিন্দদাস এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন পদকর্তা মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, মুকুন্দ দত্ত, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দ ঘোষ, রায় শেখর, গোবিন্দ আচার্য, কবিরঞ্জন প্রভৃতির পদাবলীতে বৈষ্ণব সাহিত্য সমৃদ্ধতর হয়ে উঠে। তবে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর থেকেই বাংলার আকাশে বাতাসে পদাবলী কীর্তনের সুর ছড়িয়ে পড়ে। রাধাকৃষ্ণের লীলাকথাই পদাবলী সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য ছিল, কিন্তু চৈতন্যের যুগে এর সঙ্গে যুক্ত হয় গৌরলীলা।

সারা বাংলার জনমানস বৈষ্ণব রসের ধারায় কীভাবে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

> ''চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলাদেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এককণ্ঠ বিহারী বৈঠকী সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল। তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ হিল্লোলে সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নতুন সুরে আকাশ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগ রাগিনীর ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নতুন কীর্তন উঠিল। যেমনি ভাবের তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর– অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করার জন্য ক্রন্দনধ্বনি। বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটি মাত্র বিরহিনীর বৈঠকী কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্ব জগতের ক্রন্দনধ্বনি।''[৯]

বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে তখন এক অপার্থিব আনন্দের বান ডেকেছিল, বাঙালির কণ্ঠে কণ্ঠে রাধাকৃষ্ণের লীলা গান এবং হৃদয়ে ভাবের প্লাবন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়–

> ''বৈষ্ণব ধর্ম প্লাবনের সময় বিশ্বপ্রেম যেদিন বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে সমস্ত কৃত্রিম সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া উচ্চ নীচ শুচি অশুচি

সকলকেই এক ভগবানের আনন্দলোকে আহ্বান করিল। সেই দিনকার বাংলাদেশের গান বিশ্বের গান হইয়া জগতের নৃত্য সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।"[১০]

বৈষ্ণব পদাবলীর এই সর্বগ্রাসী প্রভাব হতে রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে অব্যাহতি পাননি তা তাঁর নিজের উক্তি থেকেই বোঝা যায়–

"গাছের বীজের মধ্যে যে অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতুহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল।"[১১]

রবীন্দ্রমানস গঠনে বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব যে কতটা গভীর ছিল সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের স্বীকৃতি–

"বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষদ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরী করিয়াছে। নাইট্রোজেন যেমন করিয়া মেশে তেমনি করিয়াই তাঁহারা মিশিয়াছে।"[১২]

মাত্র ১৩/১৪ বছর বয়স থেকেই তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর একজন উৎসাহী পাঠক ও সমঝদার। তাঁর নিজের ভাষায়–

"আমার বয়স যখন তের-চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহ সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি, তার ছন্দ রস ভাব ভাষা সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণব ধর্মমতের মধ্যে আমি প্রবেশ লাভ করেছিলুম।"[১৩]

তাই স্বভাবতই বৈষ্ণব পদাবলীর ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন–

"বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বসন্তকালের অপর্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মতো, যেমন তাহারা ভাবের সৌরভ তেমনি তাহার গঠন সৌরভ।"[১৪]

বাল্যকালে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কবির উপর অভুতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এই সম্বন্ধে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন–

''একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আর এক লাইন অবিচ্ছেদ জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দ খানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না।''[১৫]

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি এই সহজাত প্রীতি তাঁকে কীর্তন গানের প্রতি আকৃষ্ট করে। কীর্তনের প্রতি তাঁর আসক্তির গভীরতা অনুধাবন করা যায় তাঁর নিজের উক্তি হতে–

''কীর্তন সংগীত আমি অনেককাল থেকেই ভালবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোন সঙ্গীতে এমন সহজভাব আছে বলে আমি জানি নে।''[১৬]

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি কবির এই গভীর আকর্ষণের প্রথম ফলশ্রুতি 'ভানুসিংহের পদাবলী'। ১৬ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে কবির 'ভানুসিংহ' ছদ্মনামে রচিত পদাবলীগুলি যে তাঁর জন্মগত জাগ্রত প্রতিভার সাক্ষি। এই পদগুলি রচনায় জয়দেব, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাসের প্রভাবই সমধিক দেখা যায়।

এই পদ রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন,–

''একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম; তখনই এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কা মাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'বেশ তো, এ তো বেশ হইয়াছে।''[১৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচার করেছিলেন যে–

> ‘‘সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক কোনো প্রাচীন কবির পদ কাপি করিয়া আনিয়াছি।’’[১৮]

এই লেখা পড়ে সকলেই অকপটে স্বীকার করেছেন যে এটা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের থেকেও শ্রেষ্ঠ রচনা। বালক বয়সেই পদাবলীর ভাষা সম্বন্ধে শিশু রবীন্দ্রনাথের মনে কৌতুহল জাগে। এই কৌতুহলের বশেই তিনি দাদাদের ডেক্স থেকে পদাবলীর বই নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে একাই পড়তে থাকেন। চৌদ্দ বছরের ছেলের কাছে পদাবলীর ভাব, অর্থ দু’টোই ছিল বোধগম্যহীন। কিন্তু তবুও তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন পদাবলীর সুর, ধ্বনি ও ভাষার লালিত্যে আপন সৃষ্টির সাধনায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

ভানুসিংহের পদাবলীর প্রথম রচনার সময়কাল ইংরাজি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে এবং ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বর্ষাকালে। ‘গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে’ এইটিই এই পর্যায়ের সর্ব প্রথম রচনা। ভানুসিংহের পদাবলীতে মোট ২২টি পদ রচিত হয়। এই ২২ টি পদের মধ্যে ৯ টি পদের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে। সুরারোপিত পদগুলির প্রত্যেকটিরই রাগ ও তালের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১২৮৪ সালের আশ্বিন মাসের ‘ভারতী’ পত্রিকায় সর্বপ্রথম ‘সজনী গো, আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা’– পদটি প্রকাশিত হয়। পরে এটাই পরিবর্ত্তিত হয় ‘সজনি গো’ শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা’ গান হিসাবে পরিচিত হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ ‘ভানুসিংহের পদাবলী’র কয়েকটি মাত্র গানের উল্লেখ করা হল এবং সেগুলির উপর যে সকল বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রভাব পড়েছে তাঁদের নাম এবং পদগুলির প্রথমাংশ উদ্ধৃত হলো–

।। ১ ।।

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরী ত্রাস লোকলাজে সজনি, আও লো।।

তুলনীয় গোবিন্দদাসের পদ–

শারদ চন্দ্র পবন মন্দ বিপিয়ে ভরিল কুসুম গন্ধ।

ফুল মল্লিকা মালতী যূথি মত্ত মধুকর ভোরনি।।

।। ২।।

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী, শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।

কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে, বালা বিষণ্ণ।।

তুলনীয় জয়দেবের পদ–

নাম সমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেনুম্।

বহু মনুতে মনুতে অনুসঙ্গত পবনচলিত মপি রেণুম্।।

অথবা

পতিত-পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপয়ানম্ ।

রচয়িত শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।।

।। ৩।।

শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথ যামিনী রে।

কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব অবলা কামিনী রে।।

তুলনীয় রায় শেখরের পদ–

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনী চমকই।

কুলিস-পতন শরদ ঝন ঝন পবন খরতর বলগই।। ইত্যাদি।

ভানুসিংহের পদাবলীগুলি প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং খণ্ড খণ্ড পদের সমষ্টি। প্রাচীন পদকর্তাদের রচিত পদাবলীর মত ভানুসিংহের পদাবলীও কথা, সুর ছন্দ বৈচিত্র্যের দ্বারা রসময় সৃষ্টি। এই পদাবলীগুলি প্রাচীন পদাবলীর মত শুধুমাত্র কীর্তনের সুরেই রচিত নয় এতে অন্যান্য আঞ্চলিক সুরেরও প্রভাব দেখা যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর মতো ভানুসিংহের পদাবলীতে ইচ্ছামত আখর বা বোলতান যোগ করা যাবে না। কবির নির্দিষ্ট করা আখর ছাড়া এবং অন্যান্য পদাবলীর মতো ভানুসিংহের পদাবলীকে সম্পূর্ণ কীর্তনের সুরে গাওয়া হয় না।

বৈষ্ণব পদকর্তা ভানুসিংহ ও পরিণত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে চিন্তার মৌলিকতা রক্ষা পেলেও বয়স্ক প্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জ্ঞানসমৃদ্ধির স্পষ্ট ছাপ, ভাষা তথা চিন্তার গভীরতা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে বলে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা অনেকেই মনে করেন। কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেম ও পূজা একই আসনে আসীন। কিন্তু এই পদাবলীর বিশেষ করে একটি পদে ভানুসিংহের সাথে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব মিল দেখা যায়।

''মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান''– এই পদটিতে ভানুসিংহের কিশোরত্ব লোপ পেয়ে ভানুসিংহ ও রবীন্দ্রনাথ একই চিন্তা ভাবনায় সম্পৃক্ত হয়ে অভিন্নরূপে প্রকাশিত। রবীন্দ্র দর্শনে মৃত্যু মহাজীবনের রূপান্তর। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের প্রকাশ এবং মাধুর্য রক্ষিত হয়। তাই কবির দৃষ্টিতে মৃত্যু অপার শান্তির পারাবার।

উল্লেখ্য, ভানুসিংহের পদাবলী ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব পড়েছে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির গানে 'প্রভু', 'নাথ', 'প্রিয়' সম্বোধন বৈষ্ণব পদাবলীর 'সখি', 'বধূঁ', 'নাথ' প্রভৃতি প্রিয় সম্বোধনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আসল কথা যে এ সকল মধু সম্বোধন ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানেরও বিশেষ করে 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র অধিকাংশ গানের ভাব ভাষা ছন্দ ও রসলালিত্যের সাদৃশ্য প্রায় সমান।

।। পাঁচ।।

মাত্র সতের (১৭) বছর বয়সে তিনি প্রথমবার বিলেতে যাত্রা করেছিলেন। সেখানে অপেরা দেখে তিনি বিদেশি গান ও সুরের প্রতি অসীম আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর দুর্দমনীয় আগ্রহ ও দুর্বার কৌতূহল তাঁর কবি হৃদয়ে যে সুবিপুল অলোড়ন জাগায় তারই প্রত্যক্ষ প্রভাব আমরা লক্ষ করি তাঁর অনতিকালের মধ্যে রচিত 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা' নামক তিনটি গীতিনাট্যের অনেকগুলি গানে।

বিলেতে রবীন্দ্রনাথ যে শুধু পাশ্চাত্য সংগীতের চর্চা করতেন তাই নয়, স্ব-রচিত বাংলা গান গেয়ে তিনি ইংরেজ মহলে রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিলেন। একদিকে ইংরেজি গান পরিবেশনে, অন্যদিকে বিদেশি গানের সুরে বাংলা গানের রচনায় ইংলণ্ডের তরুণীমহল রবীন্দ্রনাথকে উষ্ণ

অভিবাদনে অভিনন্দিত করে।

'বাল্মীকি প্রতিভা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম সৃষ্ট গীতিনাটক এবং এই নাটকেই তিনি প্রথম অভিনয় করে নিজের প্রতিভার অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রেখেছিলেন। অতি অল্পবয়সেই তাঁর কবিসত্তার উদ্বোধন ঘটেছিল। ঠাকুরবাড়ির দেশী-বিদেশী সঙ্গীতের এই নির্মল পরিবেশের মধ্যেই ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে মাত্র ২০ বছর বয়সে 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচিত হয়। এর পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে এটিকে তিনি পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত রূপে প্রকাশ করেন।

ইউরোপের হার্বাট স্পেন্সারের সঙ্গীত সম্পর্কীয় মতবাদ কবির সঙ্গীত চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে নতুন রূপ দিয়েছিল। তিনি এ বিষয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন–

> ''হার্বাট স্পেন্সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয়, সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে।''[১৯]

'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্য এই মতানুযায়ী সৃষ্ট। এই নাট্যে সঙ্গীতই কেবলমাত্র প্রাধান্য লাভ করেনি– নাট্য বিষয়টাকে সুর করে অভিনয় করা হয়, স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য অতি অল্প।

'বাল্মীকি প্রতিভা' কোন শ্রেণির নাটক সে সম্বন্ধে কবি নিজেই বলে গেছেন–

> ''য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি প্রতিভা তাহা নহে, ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।''[২০]

এই নাটকটিতে কবির সংগীত সম্বন্ধীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক সার্থক উত্তরণ ঘটেছে এবং সঙ্গীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা যে অসংগত বা নিষ্ফল হয়নি নাটকটির জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। এর গান সম্বন্ধেও তিনি 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে অপূর্ব সুন্দরভাবে বলেছেন–

> ''ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ; ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই, একটা লয়ের মাত্রা আছে; ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা, কোনো

বিশেষ রাগিনী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকি প্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।"[২১]

কবিগুরুর উক্তি থেকে বাল্মীকি প্রতিভা গীতি নাটকটির তাল, লয়, সুর তথা অভিনয় বিষয়ক যে কবিচিন্তা প্রতিভাত হয়েছে তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং গীতি-নাটকটির রূপ সুস্পষ্ট।

দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকির রূপান্তরের বর্ণনাই এই নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয়। এই গীতিনাট্যের রচনা রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা– সঙ্গীতের পরীক্ষা, কবির নিজস্ব প্রতিভা, অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর আত্মপ্রকাশ এই সমস্ত কিছুর মিলিত প্রচেষ্টা তাঁকে নতুন উপলব্ধি আস্বাদ দিয়েছিল। নাটকের শেষ দৃশ্যে বীণাপানি যে বীণা বাল্মীকিকে উপহার দিয়ে বললেন–

"আমি বীণাপানি তোরে এসেছি
শিখাতে গান–
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ–"

এ বীণা যেন বাল্মীকি রূপ পরিগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথের জীবনে এসেছে এবং অনুরণিত হয়েছে বার বার, আর সে অনুরণন যেন সমস্ত জগতের কানে কানে পৌঁছেছে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জীবনে দেবীর এই আশীর্বাণী চরম পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে। এহেন অভিমত অনেক সমালোচকই মুক্ত কণ্ঠে উল্লেখ করেছেন।

'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যটি ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গীতিনাট্যটির প্রতি টান রবীন্দ্রনাথের নেহাৎই শিল্পগত, মর্মগত নয়। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলেছেন–

"বাল্মীকি প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণির আরও একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া।"[২২]

'বাল্মীকি প্রতিভার' অসামান্য সফলতাই রবীন্দ্রনাথকে 'কালমৃগয়া' রচনার প্রেরণা যোগায়। পরবর্তীকালে এই গীতিনাট্যের অনেকটা 'বাল্মীকি প্রতিভার' সঙ্গে যুক্ত করার ফলে গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয়নি।

'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'কালমৃগয়া' প্রথম অভিনয় রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনি এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। 'কালমৃগয়া' গানের সূত্রে নাট্যের মালা এবং এর নাট্য বিষয়টাকে কেবলমাত্র সুর করে অভিনয় করা হয়। আলাদা কোন সঙ্গীতের মাধুর্য এই গীতিনাট্যটিতে খুবই কম। দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্র বধকে কেন্দ্র করেই 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যটি রচিত। 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যের করুণ রস শ্রোতার মন বিষণ্ণ ও বিচলিত করে তোলে। এই গীতিনাট্যের নাট্যরসটিই মুখ্য, সঙ্গীত এখানে গৌণ।

'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে। 'মায়ার খেলা' যখন রচিত হয় কবির মন-প্রাণ তখন গানের রসে অভিষিক্ত। এই নাটকটি ঘটনা স্রোতের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেনি– হৃদয়াবেগের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে কবি বলেছেন–

> ''ইহার অনেককাল পরে 'মায়ার খেলা' বলিয়া আর-একটা গীতনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত 'মায়ার খেলা' যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়া ছিল।''[২৩]

রবীন্দ্র সঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভাবের সঙ্গে কথা ও সুরের যে হরগৌরী মিলন তা 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে বিস্ময়কর রূপে প্রকাশিত। তাই এই ভাব স্পন্দন প্রকাশ পেয়েছে এর গানগুলির মধ্যে।

'মায়ার খেলা' গদ্য-নাটিকা 'নলিনী'র ছায়াবলম্বনে রচিত। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সখি সমিতি'র জন্য নাটিকাটি লিখিত হয়। বিভিন্ন নাটকে নানা প্রকার পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর মায়ার খেলায় কবির গীতিচেতনা পূর্ণতাভিমুখী। 'মায়ার খেলা'র বিষয়বস্তু প্রেম। সঙ্গীতের মতই রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা এখানে একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। রবীন্দ্র প্রেমতত্ত্বের সবচেয়ে বড় কথা হল প্রেমের পূর্ণতার জন্য দুঃখের ভোগ একান্তই দরকার– প্রেমের মোহ মাদকতায় আকৃষ্ট হলে সত্যকার প্রেম। উপেক্ষিত হয়, আর প্রেমের এই মোহ কাটিয়ে উঠলে তবেই প্রেম হয় চিরস্থায়ী। দুঃখের মধ্যেই প্রেমের পূর্ণতা,

'মায়ার খেলা' নাটকের মধ্য দিয়ে কবি এই ভাবনাই ব্যক্ত করেছেন।

শেষে দেখা যায় যে নাটক বা গীতিনাট্য হিসাবে 'মায়ার খেলা'র সার্থকতা নেই, গানই এর প্রাণ। গানগুলিকে নাট্যসূত্রে গাঁথা হয়েছে, সুতরাং গানই এই নাটকের সংলাপ, আর এই গানের মধ্য দিয়েই এই নাটকে রস পরিবেশিত হয়েছে। সঙ্গীতের ইতিহাসে ''মায়ার খেলা'' এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এখানেই কবির সাঙ্গীতিক প্রতিভা যেন সর্বতোভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র –

১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *সঙ্গীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ১৫

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২১, পৃঃ ৩৫।

৩. তদেব, পৃঃ ৩৫।

৪. তদেব, পৃঃ ৫৬-৫৭।

৫. তদেব, পৃঃ ১৫২।

৬. তদেব, পৃঃ ৮১।

৭. অমিতাভ চৌধুরী, *জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার*, সপ্তর্ষি, কলকাতা, ২০১২, পৃঃ ১১০।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২১, পৃঃ ৮০।

৯. শম্ভুনাথ ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত (প্রশ্নোত্তরে ১ম খণ্ড)*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃঃ ৯।

১০. তদেব, পৃঃ ৯।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২১, পৃঃ ৮৫।

১২. শম্ভুনাথ ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত (প্রশ্নোত্তরে ১ম খণ্ড)*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃঃ ১০।

১৩. তদেব, পৃঃ ১০।

১৪. তদেব, পৃঃ ১০।

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২১, পৃঃ ৫০।

১৬. শম্ভুনাথ ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত (প্রশ্নোত্তরে ১ম খণ্ড)*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃঃ ১০।

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২১, পৃঃ ৮৫।

১৮. তদেব, পৃঃ ৮৫।

১৯. তদেব, পৃঃ ১১৬।

২০. তদেব, পৃঃ ১১৬।

২১. তদেব, পৃঃ ১১৭।

২২. তদেব, পৃঃ ১১৭।

২৩. তদেব, পৃঃ ১১৭।